শিবলী সায়েদ

২রা অক্টোবর, ২০২২

আমি শিবলী সায়েদ, আমার জন্ম ১৯৭৮ সালের ৪ নভেম্বর। আমার ছোটবেলায় অর্থাৎ ৮৫এর দিকে বাড়ি থেকে বের হলেই ছিল খেলার মাঠ, মাঠের পরে স্কুল। বাড়ি থেকে বের হয়ে আগে মাঠে অন্যান্য বন্ধুদের সঙ্গে নির্ভেজাল আড্ডা মেরে তারপর স্কুলে ঢুকতাম। স্কুল শেষ হলে স্কুলব্যাগ স্কুলের বারান্দায় রেখে মাঠে আগে ফুটবল-ক্রিকেট ইত্যাদি খেলতাম, তারপর বাড়িতে আসতাম। রাত করে বাড়ি ফিরলে বাবা-মায়ের বকুনি তো সইতেই হতো। বিনোদন বলতে এরিয়েল দিয়ে দেখা টিভি। আমি যখন ক্লাস ফাইভে পড়ি, তখন আমাদের বাড়িতে শাদাকালো টিভি আসে। সিনেমার দিন সবাই আমাদের বাড়িতে টিভি দেখতে আসতো, সেই বয়সে এটা সমাজের সঙ্গে একটা যোগাযোগে বেঁধে দিত। আমাদের বাড়িতে যখন টিভি ছিল না, আমিও অন্যদের বাসায় টিভি দেখতে যেতাম। যোগাযোগটা ছিল মৌলিক, হার্দিক এবং আন্তরিক। মফস্বলে বড় হয়েছি, ফলে পাড়ায় পাড়ায় মারামারি ঝগড়াঝাঁটি ছিল না। কোনো সমস্যা হলে লোকে বাপমায়ের কাছে নালিশ করতো, কখনো দুইদিকের বাপমায়ের মধ্যে সমঝোতা হতো, এখন যা অভাবনীয়। আমার ছেলেবেলাটা তাই নানা দিক থেকে অত্যন্ত বৈচিত্রময়।

আমার বাবা আব্দুল মালেক ছিলেন হাইস্কুলের স্কুলশিক্ষক। মা নিলুফার আক্তার ছিলেন প্রাইমারি স্কুলের স্কুলশিক্ষক। শিক্ষকপরিবারের সন্তানরা একটু ভয়ে ভয়ে থাকে, কারণ তাদের বাবামায়েরা চান না তাঁদের সন্তানদের নামে কেউ নালিশ করুক। আমরা বেশ কড়া শাসনে মানুষ হয়েছি। তবে শাসনের ফাঁকে আদরেরও কমতি ছিল না। ভালো রেজাল্ট করলে আব্বা চাইবার আগেই একটা শার্ট নিয়ে আসতেন অথবা ভালো খাবারের আয়োজন হতো বাড়িতে। বাইরে খাওয়ার এত প্রচলন ছিল না তখন। শুক্রবার বাড়িতে গরুর মাংস-ডাল-ভাত-লেবু এই ছিল মেনু। সকালে একহাতে ব্যাগ নিয়ে সাইকেল চালিয়ে বাবা মফস্বলের বাজারে যেতেন, প্রচুর মাছ পাওয়া যেত তখন। বাবাকে ভয় পেতাম বেশ। তিনি মারা গেছেন ২০১৪তে। আমরা তিন ভাই। বড়ভাই মাহমুদুল হাসান ব্যাংকে চাকরি করেন। আমি মেজ। আমার ছোট ভাই মুনতাসির মামুন আমেরিকাতে থাকে, আমাদের প্রত্যেকের এক ছেলে এক মেয়ে। তিন ভাই তিন জায়গায়, সাপ্তাহিক যোগাযোগ হয় হোয়াটস্যাপে বা মেসেঞ্জারে।

আমি সিলেটের শাহজালাল ইউনিভার্সিটিতে সিভিল অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে ভর্তি হই ১৯৯৬এ। চার বছরের কোর্স রাজনৈতিক ঝামেলার কারণে শেষ হয়েছে ৬ বছরে। ক্যাম্পাস ছোট ছিল। শুক্রবার রাতে আমরা সিনেমা দেখতাম, আড্ডা মারতাম। সিলেটের নালা, ছড়া, হাওরের প্রচুর তাজা মাছ আসতো। সিলেটে যদ্দিন ছিলাম, মাছ খেয়েছি। বন্ধুদের সঙ্গে এখনো যোগাযোগ আছে।

বাবা-মায়ের সঙ্গে সবচেয়ে স্মৃতিময় মুহূর্ত বিলেতে আমার গ্র্যাজুয়েশন সেরেমনি। ইউনিভার্সিটি থেকে বলা হলো, এই অনুষ্ঠানে যদি বাবা-মাকে আনতে চাই তাহলে তাঁরা চিঠি ইস্যু করবেন, সেটা দূতাবাসে জমা দিলেই হবে। আমি তখন ছাত্র, কোনো চাকরিও করি না, বাবা-মায়ের জন্য অ্যাপ্লাই করলাম, ভিসাও দিয়ে দিল। মফস্বলের মানুষরা বলছিল, ভিসা দেবে না, অযথা এত টাকা খরচ করছে! বিমানবন্দরে যখন বাবা-মাকে নিতে যাই সে অনুভূতি অবিস্মরণীয়। আমার কারণে বাবা-মা ইংল্যান্ড আসতে পারলেন, সেই রোমাঞ্চে সারারাত আমরা তিনজন ঘুমাতে পারিনি। তিন সপ্তাহ আমরা একসঙ্গে ছিলাম। সেটা অনেক আনন্দের স্মৃতি।

আমার স্ত্রী রাফিজা ফারহানা, এনএইচএসে হেলথ কেয়ার অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে কাজ করেন। আমাদের দুই ছেলেমেয়ে, বড় ছেলে রমিন সায়েদ, ক্লাস ফোরে পড়ে, আর মেয়ে রাইমা সায়েদ নার্সারি শুরু করেছে। আমি ১৪ বছর ধরে নরউইচে আছি, রাফিজা আছে ১১ বছর ধরে।

ইংল্যান্ডে আসবার কোনো পরিকল্পনা আমার ছিল না। ২০০৪এ আমি ঢাকায় চাকরি করতাম, ব্র্যাক ওয়ার্ল্ডের চাকরির বিজ্ঞপ্তিতে দেখলাম আফগানিস্তানে কিছু ইঞ্জিনিয়ার পাঠানো হবে সেদেশের রাস্তা-স্কুল ইত্যাদি পুনঃনির্মাণের জন্য। ইন্টারভিউ দিয়ে কাজ পেলাম, ২০০৫এ আফগানিস্তান নামলাম, তখন সেখানে তাপমাত্রা ৩ ডিগ্রি। কাবুল থেকে বহু দূরে তালিবান-অধ্যুষিত এলাকায় আমার চাকরি। সবজি পাওয়া যায় না, শুধু গরুর মাংস, খাবারদাবারের চালান আসে পাকিস্তান বর্ডার থেকে। চমৎকার নানরুটি পাওয়া যেত, মচমচে অথচ নরম। আমি যাওয়ার ৩-৪মাস আগে তালিবানরা অফিস কম্পাউন্ডে বোমা মেরে টয়লেট উড়িয়ে দিয়েছে। কত রাত গোলাগুলির শব্দে ঘুম ভেঙে যেত। স্থানীয় লোকজন অবশ্য মুসলমান হিসেবে আমাদের ভাইয়ের মতো দেখতো। ২০০৬এর মার্চে ছুটিতে বাই-রোডে আফগানিস্তান থেকে পাকিস্তান আসবার সময় পেশোয়ারে দেখলাম গাড়ি ভাঙচুর হচ্ছে। জীবন সেখানে কঠিন। তবে আমরা সবসময় একদল সমবয়স্ক মানুষ একসঙ্গে থাকতাম, কেউ অ্যাকাউন্টান্ট, কেউ কম্পিউটার সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার। তাই ভয় কম লাগতো। যখন আফগানিস্তানে কাজ করি, তখন আমার ইংল্যান্ডপ্রবাসী বন্ধু জাবেদ বল্লো মাস্টার্স করতে এখানে চলে আসতে। এখানে চাকরিবাকরির সুবিধা হবে। জাবেদ নিজের পয়সা দিয়ে ইউনিভার্সিটি অভ ইস্ট লন্ডনের অ্যাডমিশন যোগাড় করলো, আই-টোয়েন্টি লেটার পাঠালো। আফগানিস্তানের চাকরি ছেড়ে বাংলাদেশে গেলাম, ভিসা নিয়ে ইংল্যান্ড চলে এলাম।

ইস্ট লন্ডনে দুই বছর কাটাবার পর ২০০৮এর ডিসেম্বরে নরউইচে এলাম চাকরি নিয়ে। আসবার পর আমাকে নিয়ে আমার লাইন ম্যানেজার বেশ কিছু জায়গা ঘুরিয়ে দেখালো, পটার হাইয়েমের ফিশ ব্যারিয়্যার দেখালো, গ্রেট ইয়ারমাউথের সিটি ফেন্স দেখালো, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সাইট দেখালো। ঐদিনই নরউইচকে ভালো লেগে গেছিল— ব্রডস আছে, সমুদ্র আছে, জঙ্গল আছে, ভারী বিচিত্র। নরউইচ তখন এত ব্যস্ত ছিল না, এত বাড়িঘর ছিল না, নানা জাতের মানুষের সমাবেশও ছিল না, এখানকার স্থানীয় জনগণ অর্থাৎ বৃটিশ হোয়াইটরাই তখন বেশি ছিল। এখনো তাঁরা সংখ্যাগুরু। যখন বাচ্চারা জন্মায়নি তখন আমি আর আমার স্ত্রী ছুটির দিনে শহরের নানান জায়গায় হেঁটে বেড়াতাম। মেডো মার্কেট স্ট্রিটে যেতাম, শপিং সেন্টারগুলোয় ঘুরতাম, লর্ড মেয়র ফেস্টিভ্যালে যেতাম, ৩১ ডিসেম্বরের আতশবাজি দেখতে যেতাম। এখন আমি কাজ করছি এনভায়রনমেন্ট এজেন্সিতে, আমার কাজ মূলত ফ্লাড ম্যানেজমেন্ট, বাঁধগুলোর তত্ত্বাবধান করা। সমুদ্রের পাড়ে অনেকসময় ইনস্পেকশনে যেতে হয়, আমি আমার চাকরি খুব উপভোগ করি। অবসরে হিন্দি মুভি দেখি, বাচ্চারা অবশ্য ল্যাপটপে-ফোনে অনেক সময় কাটায়।

আমাদের বাঙালি কমিউনিটিকে নিয়ে ন্যাশনাল সেন্টার ফর রাইটিং-এর এই উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। অনাগতকালের মানুষরা জানবে আমরা বাঙালিরা এখানে কীভাবে বেড়ে উঠেছি, আমাদের জীবনযুদ্ধ কেমন ছিল। এখন তো এখানে কিছুদিন পরপরই নানান অনুষ্ঠান হচ্ছে, বাচ্চারা পারফর্ম করছে। এসবই ভালো উদ্যোগ।